**মুর” সম্রাটদের হাতে গড়ে ওঠা প্রাচীন পুণ্ড্র নগরীর অজানা কিছু কথা।**

**সংস্কৃত কবি সন্ধ্যাকরনন্দীর স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন করতোয়া নদীর তীরের শহর পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। মহাস্থানগড়ের বিস্তীর্ণ ধবংসাবশেষ প্রাচীর পুন্ড্রবর্ধনভূক্তির রাজধানী পুন্ড্রনগরের সুদীর্ঘ প্রায় আড়াই হাজার বছরের গৌরবোজ্জল ইতিহাসের এক নীরব স্বাক্ষী। এ ধবংসাবশেষ বগুড়া জেলা শহরের ১৩ কিঃমিঃ উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। সমগ্র বাংলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন এ দূর্গনগরী পর্যায়ক্রমে মাটি ও ইটের বেষ্টনী প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত যা উত্তর দক্ষিনে ১৫২৫ মিঃদীর্ঘ এবং পূর্ব পশ্চিমে ১৩৭০মিঃ প্রশস্থ ও চতুপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হতে ৫মিঃ উচু। বেস্টনী প্রাচীর ছাড়াও পূর্ব দিকে নদী ও অপর তিনদিকে গভীর পরিখা নগরীর অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন হতে জানা যায় যে, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ স্থান পরাক্রমশালী মৌর্য , গুপ্ত এবং পাল শাসকবর্গের প্রাদেশিক রাজধানী ও পরবর্তীকালে হিন্দু সমান্তরাজাগণের রাজধানী ছিল। দূর্গের বাইরে উত্তর ,পশ্চিম , দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম ৭/৮ কিলোমিটারের মধ্যে এখনও বিভিন্ন ধরণের বহু প্রাচীন নিদের্শনরয়েছে যা উপ-শহরের সাক্ষ্য বহন করে। উল্লেখ্য, বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে (৬৩৯-৬৪৫) পুন্ড্রনগর পরিদর্শন করেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রত্নতত্ববিদ স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষকে ফুয়েন সাঙ বর্ণিত ‘পুণ্ড্র’ নগর হিসেবে সঠিকভাবে সনাক্ত করেন।**

**১৯২৮-১৯২৯সালে মহাস্থানগড়ে সর্ব প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কার্য শুরু করা হয়। এসময় নগরীরর মধ্যে’ বৈরাগী ভিটা’ মুনির ঘোন ও বাইরে গোবিন্দ ভিটা নামক ৩টিস্থানে খনন করা হয়। দীর্ঘদিন পর ১৯৬০-১৯৬১ সালে এবং পরবর্তীতে ১৯৮৮ সাল হতে নিয়মিতভাবে দূর্গের বিভিন্ন অংশ উৎখনন করা হয়। ১৯৯৩ হতে বাংলাদেশ ও ফ্রান্স সরকার যৌথভাবে মহাস্থানগড় খনন শুরু করায় এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা পায়। প্রথম পর্যায়ে ১৯৯৯ পর্যন্ত পূর্বদূর্গ প্রাচীরের মধ্যবর্তী এলাকায় খনন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০০ সাল থেকে মাজারের পশ্চিম পাশে খনন কাজ করা হচ্ছে।**

**দীর্ঘসময় ব্যাপি ব্যাপক অনুসন্ধান ও খননের ফলে দুর্গ নগরীর অভ্যন্তরে খৃস্টাব্দচতুর্থ শতক থেকে শুরু করে মুসলিম যুগ পর্যন্ত প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে বসতি নিদর্শন উম্মোচিত হয়েছে। ১৮টি স্তরে প্রাক মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও মুসলিমযুগের কাঁচা পাকা ঘর বাড়ী, রাস্তা, নর্দমা, নালা কুপ, মন্দির, মসজিদ, তোরণ, বুরুজ ইত্যাদি উম্মোচিত হয়েছে। এসব স্থাপত্যিক কাঠামো ছাড়াও আবিস্কৃত হয়েছে। তদানীন্তন নগরজীবনের বিভিন্ন অস্থাবর সাংস্কৃতিক দ্রবাদি যেমন মৌর্য যুগের টাপিযুক্ত শিলা খণ্ড, ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা ও ছাঁচে ঢালাতাম্র মুদ্রা, ব্লাক এন্ড বেচ চেয়ার, বুলেটেড ওয়ার, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, শুংগ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত পোড়ামাটির ফলক, প্রস্তরখণ্ড ও পোড়ামাটির মূর্তি স্বল্প মূল্যবান প্রস্তর গুটিকা গোলক, জালের কাঠি এবং মাটির ও ধাতব দ্রব্যাদি, প্রচুর সাধারণ মৃৎপাত্র এবং আরবি উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একটি প্রস্তর ফলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।**

**মাজার শরীফ মহাস্থান বাস স্ট্যান্ড থেকে কিছু পশ্চিমে হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (র:) এর মাজার শরীফ অবস্থিত। কথিত আছে মাছের পিঠে আরোহন করে তিনি বরেন্দ্র ভূমিতে আসেন। তাই তাকে মাহী সওয়ার বলা হয়। কথিত আছে হযরত মীর বোরহান নামক একজন মুসলমান এখানে বাস করতেন। পুত্র মানত করে গরু কোরবানী দেয়ার অপরাধে রাজা পরশুরাম তার বলির আদেশ দেন এবং তাকে সাহায্য করতেই মাহী সওয়ারেরর আগমন ঘটে।**

**কালীদহ সাগর গড়ের পশ্চিম অংশে রয়েছে ঐতিহাসিক কালীদহ সাগর এবং পদ্মাদেবীর বাসভবন।**

**গড়ের পূর্বপাশে রয়েছে করতোয়া নদী এর তীরে ‘শীলাদেবীর ঘাট। শীলাদেবী ছিলেন পরশুরামের বোন। এখানে প্রতি বছর হিন্দুদের স্নান হয় এবং একদিনের একটি মেলা বসে।**

**জিউৎকুণ্ড এই ঘাটের পশ্চিমে জিউৎকুণ্ড নামে একটি বড় কুপ আছে। কথিত আছে এই কুপের পানি পান করে পরশুরামের আহত সৈন্যরা সুস্থ হয়ে যেত।**

**মিউজিয়াম মহাস্থান গড় খননের ফলে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন যুগের বিভিন্ন দ্রব্যাদিসহ অনেক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে যা গড়ের উত্তরে অবস্থিত জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।**

**বেহুলার বাসর ঘর মহাস্থানগড় বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় ২কি.মি দক্ষিণ পশ্চিমে একটি বৌদ্ধ স্তম্ভ রয়েছে যা সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। স্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। স্তম্ভের পূর্বার্ধে রয়েছে ২৪ কোন বিশিষ্ট চৌবাচ্চা সদৃশ একটি বাথরুম ।এটি বেহুলার বাসর ঘর নামেই বেশি পরিচিত।**

**কামরুল হাসান আহমেদ**

**প্রাক্তন ছাত্র**

**সংস্কৃত বিভাগ**

**রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।**